



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 364 - 377

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা নাটক ও নজরুলের গান : একটি পর্যালোচনা

প্রেম কুমার মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : pkmpremkumarmandal@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Nazrul Islam,
play, song,
Manmatha Roy,
Sachindranath
Sengupta,
compose,
lyrics,
metaphorical,
symbolic,
folk melody.

Abstract

Since birth, Nazrul Islam has been a teacher of the Maktab, muezzim, a poet of the Leto group, an employee of a bread shop, a soilder-lover-rebel-fakir and sometimes a saint – with a life made up of such Dramatic elements, Nazrul started writing a play as a poet of the Leto group a series of play whose dramatic value is insignificant, but it cannot be denied that it was the poet's first attempt. However, when the poet's real literary life began in 1919, it initially revolved around stories, poems, songs and novels. After a short while, he also began to lean towards plays. Nazrul Islam's first play was written while in the Baharampur Jail for the Madaripur Charandal at the request of Purnachandra Das and Narendranarayan Chakraborty. Although this play cannot be found anymore, it is Known that the famous song 'Jater Name Bajjati Sab' is form this play. Since then, he has also been associated with Bengali stage drama. And in this work, on the one hand, he has composed lyrics and composed music for several plays by others, especially Manmatha Roy and Sachindranath Sengupta, as well as Sudhindranath Raha, Debendranath Raha, Birendrakrishna Bhadra and any others, and on the other hand, he himself has written several plays including 'Aleya' and 'Madhumala' and composed songs and music to them, cementing his place in the world of Bengali stage Drama. However, his first song outside his own plas was for the drama version of Shaktipada singha of Sharatchandra's novel 'charitrahin', although the lyrics and exact date of that song have not been found. In this case, it was the songs of Sachindranath Sengupta's play 'Raktakamal' that completely connected Nazrul Islam to the stage, and after that, Nazrul rose to the top of fame by composing and composing songs for Manmatha Roy's play 'Mahua'. In the terms of creating melodies, the poet has also experimented with various songs for theatre. Just as he created new melodies by mixing different ragas, he has also shown innovation in using folk melodies. Just he has created songs like 'O Bhai Amara Nao Zatri Na Loy' by mixing the Bhatiali and sampan melodies of East Bengal, he has also created song like 'Ke Dilo Khonpate Dhutura Phul Lo' in the tunes of the Jhumur style of West Bengal. And because he is such a great music creator, even though the metaphorical and symbolic



plays he has written himself has been successful as plays even though they are lyrical.

Discussion

জন্মের পর থেকেই বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকেন নজরুল। পিতা ফকির আহম্মদ ও মাতা জাহেদার পঞ্চম সন্তান দুখু দশ বছর বয়সেই মক্তবের শিক্ষক ও ইমামদির কাজ দিয়ে জীবনের যাত্রা শুরু করেন। এর পরেই দেখা যায় কখনও তিনি মোয়াজ্জিম, কখনও লেটো দলের কবি, কখনও রুটির দোকানের কর্মচারী, কখনও সৈনিক - কখনও প্রেমিক, কখনও আমির - কখনও ফকির, কখনও বিদ্রোহী, কখনও সাধক - এক নাটকীয় জীবন পরিভ্রম। এহেন নাটকীয় উপাদানে যাঁর জীবন গঠিত নাটক যে তাঁকে আকৃষ্ট করবে তাতে সন্দেহ কী! আর নাটকে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল বাল্যে লেটো দলের কবি হিসেবে পালাধর্মী নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে। এই সময় তাঁর কয়েকটি পালাধর্মী নাটক হল— ‘শকুনি বধ’, ‘দাতা কর্ণ’, ‘মেঘনাদ বধ’, ‘রাজপুত্র’, ‘কালিদাস কবির সঙ’, ‘চাষার সঙ’, ‘ঠগপুরের সঙ’, ‘যুধিষ্ঠির’, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’, প্রভৃতি। বাল্যে লেটোর দলের জন্য রচিত এই পালাগুলির সাহিত্যমূল্য ততটা উল্লেখযোগ্য নয়— তা মুকুলিত পর্যায়ে উদাহরণ মাত্র।

নজরুলের সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিল ১৯১৯সালে করাচিতে বাঙালি পল্টনে বসে - তা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় ১৯২০সালে করাচির সৈনিক জীবন থেকে ফিরে আসার পর। প্রথমদিকে গল্প, কবিতা, গান এবং উপন্যাস রচনাতেই তাঁর অভিনিবেশ ছিল। নাটক রচনা বা নাটকের জন্য গান রচনা তিনি কিছুটা পরে শুরু করেন।

নজরুলের প্রথম নাটক রচনা বহরমপুরের জেলে বসে। নজরুল হুগলি জেল থেকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত হন ১৯২৩-সালের ১৮ই জুন। ঐ জেল থেকেই তিনি ১৯২৩-সালের ১৫ই ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন। ঐ জেলেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাদারিপুরের শান্তি-সেনা চারণ দলের অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দাস ও নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। মুজফ্ফর আহমেদ তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন - পূর্ণচন্দ্র দাসের অনুরোধে নজরুল শান্তি-সেনা চারণ দলের অভিনয়ের জন্য প্রথম নাটক লেখেন। তবে পাণ্ডুলিপিটি জেল থেকে বাইরে বেরোলেও হারিয়ে যায়। মুজফ্ফর আহমেদের স্মৃতি কথায় নাটকটি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ থাকলেও নাটকটির রচনাকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। তবে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর রোজনামচায় এসম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন—

“আমার রোজনামচা : তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩। আজ সব স্থির হইয়া গেল। বাইরে যাইয়া আমরা - পূর্ণবাবু, কাজী ও আমি চারণদল গড়িয়া তুলিব। কাজী পালা গাঁথিবেন, গানে সুর দিবেন, গান গাহিবেন। আমার উপর থাকিবে অভিনয়ের দায়িত্ব। পরিচালনার ভার থাকিবে পূর্ণবাবুর উপর।”^১

নাটকটি হারিয়ে গেলেও এর একটি গান রক্ষা পেয়েছে। বাঁধন সেনগুপ্ত জানিয়েছেন—

“বহরমপুর পর্বে কবির লাল ও সবুজ কালিতে লেখা যেসব লেখার সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে—

১. ‘জাতের নামে বজ্জাতি সব’ রচনাটি ‘জাত জালিয়াত’ নামে ৪ শ্রাবণ, ১৩৩০ সংখ্যায় বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (জুলাই ১৯২৩)। কবিতার পাদটীকায় লেখা ছিল ‘মাদারীপুর শান্তিসেনা চারণদলের জন্য লিখিত অপ্রকাশিত নাটক থেকে’। পরে এই রচনাটি উপাসনা পত্রিকা (শ্রাবণ ১৩৩০) ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা-য়ও (শ্রাবণ ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৩০) পুনর্মুদ্রিত হয়।”^২

নজরুল ইসলাম তাঁর দ্বিতীয় নাটকটিও লেখেন বহরমপুর জেলে বসেই ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে। এ নাটকটিও গানসহ লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর রোজ নামচায় নাটকটির বিষয়বস্তুর যেমন উল্লেখ আছে তেমনি কবির প্রথম মঞ্চাভিনয়ের কথাও উল্লেখ আছে।



কবি নজরুল নাটকের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন দুইভাবে। এক - নিজে নাটক রচনা করে, দুই - অন্যের লেখা নাটকে নাটকের জন্য গান লিখে এবং সুর সংযোজন করে। দ্বিতীয় কাজটিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেক বেশি এবং এই কাজটি করতে গিয়েই তিনি বেশি করে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ব্রহ্মমোহন ঠাকুর যথার্থই বলেছেন -

“সুরস্রষ্টা নজরুলকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল রঙ্গমঞ্চগুলি। রঙ্গমঞ্চে তাঁর ভূমিকাই আরম্ভ হয় অপরের লিখিত নাটকের জন্য গান রচনা ও তাতে সুর সংযোজনা করে।”^৩

নিজের লেখা নাটকের বাইরে তিনি শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাসের শক্তিপদ সিংহকৃত নাট্যরূপের জন্য প্রথম গান রচনা করেন। এখন অবশ্য গানটির কথা, সঠিক সন তারিখের কোনো হিসেব পাওয়া যায় না। এরপরেই তিনি যুক্ত হন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘রক্তকমল’ নাটকের সঙ্গে। ১৯২৯ সালের ২রা জানুয়ারি মনমোহন থিয়েটারে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের সবগুলি গান রচনা ও সুর সংযোজনা করেছিলেন নজরুল। নজরুলের এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত নাটকটি তাঁকে উৎসর্গ করে মর্মস্পর্শী ভাষায় নাট্যকার লিখেছিলেন—

“কবি নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

নজরুল,

বইখানি পড়ে খুশি হয়ে তুমি গান লিখে দিয়েছ। শুধু তাই নয়, স্বরচিত গানে তুমি সুর দিয়েছ এবং অক্লান্ত শ্রম করে সে গান তুমি অভিনেত্রীদের শিখিয়েছ। তোমার গানের দাম আমি জানি। তাই ঋণের কথা না তুলে, বইখানির সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে দিলুম।

তোমার গুণমুগ্ধ

শচীনন্দা।”^৩

নিবেদন অংশে নাট্যকার জানিয়েছেন—

“রক্তকমল প্রথমে প্রকাশিত হয় ‘নটরাজে। ... আমার পরম স্নেহভাজন কবি নজরুল ইসলাম নখানি গান রচনা করে দিয়েছেন।”^৪

অবশ্য পরবর্তীকালে অনেকেই রক্তকমলের গান সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়েছেন। এমনকি স্বয়ং নাট্যকারও ‘বাংলার নাটক ও নাট্যশালা গ্রন্থে লিখেছেন—

“নজরুল ওই নাটকের সাতখানা গান লিখে দিলেন; ইন্দুবালার চারখানি গান রক্তকমলের বড় আকর্ষণ হয়ে উঠল। ...শেফালিকা দুখানি আর সরযুবালা একখানি গান গাইতেন। রক্তকমলের এই সাতখানি নজরুল গীতিই খুব জনপ্রিয় হয়।”^৫

তবে নাটকে প্রাপ্ত গান ও যে যে চরিত্রের কণ্ঠে তা গীত হয়েছে তাতে দেখা যায় মমতা চরিত্রে তিনটি, পূর্ববী চরিত্রের কণ্ঠে চারটি ও কমল চরিত্রের কণ্ঠে দুটি গান আছে। আর এই নাটকে সরযুবালাদেবী মমতা চরিত্রে অভিনয় করেন। তাই ‘বাংলার নাটক ও নাট্যশালা গ্রন্থে নাট্যকার যে তথ্য দিয়েছেন তা যে অসাবধানতা বশত ভুল হয়ে গেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। রক্তকমল নাটকের গানগুলি হল—

১. আসে বসন্ত ফুলবনে (‘কমল’ চরিত্রের গান)
২. ফাগুন রাতের ফুলের নেশায় (‘পূর্ববী’ চরিত্রের গান)
৩. কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে (‘পূর্ববী’ চরিত্রের গান)
৪. নিশীথ স্বপন তোর ভুলে যা (‘কমল চরিত্রের গান)
৫. ভাঙা মন আর জোড়া নাহি যায় (‘পূর্ববী’ চরিত্রের গান)
৬. ঘোর তিমির ছাইল রবি শশী গ্রহতারা (‘পূর্ববী’ চরিত্রের গান)
৭. কেমনে রাখি আঁখি বারি চাপিয়া (‘মমতা’ চরিত্রের গান)
৮. মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর (‘মমতা’ চরিত্রের গান)



৯. দারুণ পিপাসায় মায়া মরীচিকায় ('মমতা' চরিত্রের গান)

'রক্তকমলে'র পর মন্থথ রায়ের 'মহুয়া' নাটকের গান রচনা ও সুর সংযোজনা করেন নজরুল। নাটকটি ১৯২৯সালে ৩১শে ডিসেম্বর মনমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'মহুয়া' নাটকের ভূমিকায় নাটককার মন্থথ রায় লিখেছেন—

“আমার লেখনীর অক্ষমতাকে এমনি করিয়াই সার্থক সুন্দর করিয়াছেন আমার গীতসুন্দর কবি নজরুল ইসলাম ...।”^৬

নাটকে মহুয়ার চরিত্রে অভিনয় করেন সরযুবালা দেবী। মহুয়ার গানের জন্যে নজরুলকে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছিল সরযুবালা দেবীকে গান শেখাতে। সরযুবালা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

“নাট্যকার মন্থথ রায় রচিত মহুয়া নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করার ডাক এলো আমার কাছে। সেটা ১৯৩০ সালের কথা। কাজীদা ঐ নাটকে আমার জন্যে সাত-আটটি রাগ প্রধান গান লিখেছিলেন। এর সব কটি গান স্টেজে উঠে আমাকে গাইতে হবে শুনে আমি বেঁকে বসলাম একেবারে, ‘ও আমি কিছুতেই পারব না। আগেরগুলি মোটামুটি সাদা-মাটা-সুরের গান ছিলো-তাই চালিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এ সব রাগসঙ্গীত গাইতে হলে রীতিমত তালিমের দরকার, গলা সাধতে হয়। একি খেলার কথা নাকি?’ এই কথা শুনে কাজীদা হা-হা করে হেসে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, ‘বাঃ বাঃ সরযুদেবী দেখছি সত্যিই বেশ বড়ো হয়ে গেছেন, কেমন বড়ো বড়ো কথা দিব্যি গুছিয়ে বলছে দেখ! আমরা কথার বেসাতি করি, আমাদেরও এতো কথা মাথায় আসেনা।’ কাজীদার এই কথা আর হাসিতে আমার সমস্ত আপত্তি ভেসে যায় যেন। আমি যতো বলি ‘না হবেনা’ উনি ততোই জেদ ধরে বলেন— ‘হ্যাঁ হতেই হবে, না হলে আমার নাম পালটে দেব। তোমায় কিছুটা করতে হবে না, একপায়ে দাঁড়াতেও হবে না, শুদ্ধু আমার সঙ্গে গাইবে আর হাসবে। ...নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে মাত্র তিনদিনের মধ্যে ঐ অতগুলি রাগপ্রধান গান একেবারে পাখী পড়ানোর মতো করে শিখিয়ে দিলেন কাজীদা। সেসব গানের সুরও তিনি তৈরি করেছিলেন অপূর্ব।’^৭

মহুয়া নাটকের গানগুলি হল—

১. ‘কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো’ (বেদে-বেদেনীর গান)
২. ‘বউ কথা কও, বউ কথা কও’ (মহুয়ার গান)
৩. ‘কত খুঁজিলাম নীল কুমুদ তোরে’ (মহুয়ার গান)
৪. ‘ভরিয়া পরাণ শুনতেছি গান’ (মহুয়ার গান)
৫. ‘একডালি ফুলে ওরে সাজাইব কেমন করে’ (বেদেনীদের গান)
৬. ‘মহুয়ার গাছে ফুটেছে ফুল’ (বেদেনীদের গান)
৭. ‘খোলো খোলো গো দুয়ার’ (পালঙ্কের গান)
৮. ‘আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ’ (বেদেনীদের গান)
৯. ‘ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয়’ (রাধু পাগলির গান)
১০. ‘আমার গহীন জলের নদী’ (রাধু পাগলীর গান)
১১. ‘তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে’ (রাধু পাগলীর গান)
১২. ‘ফণির ফণায় জ্বলে মণি’ (মহুয়ার গান)
১৩. ‘মোরা ছিনু একেলা হইনু দুজন’ (মহুয়ার গান)
১৪. ‘(ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ (মহুয়ার গান)

‘মহুয়ার’ গানগুলিতে একাধিক রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে অভিনবত্ব দান করেছিলেন গীতিকার নজরুল ইসলাম। ‘ভরিয়া পরাণ শনিতোছি গান’ গানটি বেহাগ ও বসন্ত রাগের মিশ্রণে গঠিত, ‘একডালি ফুলে ওরে সাজাইব কেমন করে’ গানটি তিলোক কামোদ ও দেশ রাগের মিশ্রণে। কবি এই নাটকেই প্রথম নানা ধরনের লোকগীতির সুর প্রয়োগের পরীক্ষা নীরক্ষায় অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এপার বাংলার বুমুর আঙ্গিকের সুরে তৈরি করলেন - ‘কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো’ ও ‘মহুয়ার গাছে ফুটেছে ফুল’ গান দুটি এবং ওপার বাংলার ভাটিয়ালি, সম্পান সুরে তৈরি করলেন - ‘ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয়’, ‘আমার গহীন জলের নদী’ এবং ‘তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে’ গানগুলি - যা সে যুগের পক্ষে দুঃসাহসিকই বটে। সেই সময় নাচঘর পত্রিকা জানিয়েছেন—

“Folk music এর সহিত প্রাণের কি একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে, একটা কি Thrill আছে, কি একটা উন্মাদনা আছে, তাহা মহামতি Tolstoi বহুপূর্বে বলিয়া গিয়াছেন। ...আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি কাজী নজরুলের সঙ্গীতের আমরা বিশেষ ভক্ত—তাহার গজল বা ঠুংরী সুরের গান অপূর্ব। বাউল, কীর্তন, ভজন, ইত্যাদির মধ্যে যে কি effect আছে এবং সে effect কত গভীর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।”^৮

নাচঘর পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় ‘মহুয়া’র গানের প্রশংসা যেমন করা হয়েছে তেমনি সমালোচনাও করা হয়েছে -

“মহুয়ার একটি বড় ত্রুটির কথা উল্লেখ না করে পারলুম না। বেদে-বেদেনীদের মুখে যে ভাষা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সাহিত্যিক হয়ে উঠেছে। এমনকি স্থল বিশেষে তা আধুনিক ড্রয়িং রুমেও ব্যবহৃত হতে পারে। কবি নজরুল মহুয়ার জন্য যে পরমসুন্দর ও কবিত্ব-বিচিত্র গানগুলি রচনা করে দিয়েছেন তারও অধিকাংশস্থলে ঐ দোষ দেখা যায়। ...শ্রীমাণ নজরুল স্বরচিত গানগুলিতে যে সব সুর দিয়েছেন বাংলা রঙ্গালয়ের পেশাদার সঙ্গীত শিক্ষকদের তা লজ্জা দিতে পারে। ‘নবশক্তির চন্দ্রশেখর বলেছেন মহুয়ার গানের সুর নাকি শেষের দিকে একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের তা মনে হল না। কারণ প্রত্যেক গানের রাগিনী ও চাল পরস্পরা থেকে এতটা বিভিন্ন যে তা একঘেয়ে হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।”^৯

‘মহুয়া’র গান এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে ডি এম লাইব্রেরি তা নিয়ে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং তা রেকর্ড সংখ্যক বিক্রি হয়।

মনমোহন থিয়েটারে ‘মহুয়া’র আগে ১০ই পৌষ ১৩৩৬-এ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘জাহাঙ্গীর’ নাটকটি অভিনীত হয়। এই নাটকে নজরুলের একটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। গানটি হল ‘রঙ্গমহলে গো রঙ্গমশাল মোরা আমরা রূপের দিপালী’। গানটিতে কবি সুরের মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ভৈরবী, আশাবরী ও ভূপালী - এই তিনটি রাগের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে।

এর পরেই নজরুল যে নাটকের গান রচনা করেন তা হল মন্থরায়ের বিখ্যাত নাটক ‘কারাগার’ - যা সেই সময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩০সালের ২৪শে ডিসেম্বর নাটকটি মনমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ১লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৮টি অভিনয়ের পর রাষ্ট্রদ্রোহের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার নাটকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরে অবশ্য জনমতের চাপে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ১৯৩১ সালের ৮ই আগস্ট থেকে নাটকটি পুনরায় নাট্যনিকেতনে অভিনীত হতে থাকে। নাটকে ধরিত্রীর ৬টি গান নিয়ে মোট আটটি গান নজরুল ইসলামের লেখা। বাকি গানগুলি রচনা করেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। একটি বাদে বাকি গানগুলির সুর সংযোজনা করেছিলেন নজরুল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নাটকের ভূমিকায় মন্থরায় লিখেছেন -

“গান রচনায় আমি অক্ষম। কিন্তু, আমার এই অক্ষমতা সার্থক হইয়াছে সেই এক পুণ্যপ্রভাতে যেদিন সারা-বাংলার কবি দুলাল কাজী নজরুল ইসলাম আমার হা’ত দুখানি পরম স্নেহে ধরিয়া বলিয়াছিলেন, “আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়া গান লেখাইয়া না লইলে আমার অভিমানের কারণ হইবে।” যে আন্তরিক স্নেহে তিনি আমার ‘মহুয়া’র কণ্ঠে গান দিয়াছিলেন এবারও আমার “কারাগারের” জন্য তেমনি আন্তরিক স্নেহে তিনি গান রচনা করিয়াছেন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্ব মুহূর্তেও তিনি



“কারাগারের জন্য শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরমোন্মত্তে উহাতে স্বয়ং সুরযোজনা করিয়াছেন। আমার আরও সৌভাগ্য বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার দরদী-কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়ও আমার প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহে ও মমতায় “কারাগারে”র জন্য কয়েকটি গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। ...ধরিত্রীর গানগুলি শ্রীযুক্ত নজরুল ইসলাম রচনা করিয়াছেন, এবং বাকী গানগুলি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা। গানগুলিতে সুর যোজনাও তাঁহারাই করিয়াছেন।”^{১০}

অবশ্য কারাগার নাটকে নজরুলের গানের সংখ্যা ছিল আটটি একথা নাচঘর পত্রিকা জানিয়েছে। তার মধ্যে ধরিত্রীর গান ছিল ৬টি এবং একটি গান গেয়েছে কঙ্কন ও কঙ্কা, অন্য একটি গান গেয়েছে চন্দনা। নাচঘর পত্রিকা লিখেছে:

“কারাগারে গানের সংখ্যা ১৮; তারমধ্যে ৮টি লিখেছেন নজরুল ইসলাম, বাকিগুলি নাচঘর সম্পাদকের। একখানি ছাড়া বাকি সব গানেরই সুর দিয়েছেন নজরুল ইসলাম।”^{১১}

‘কারাগার নাটকে নজরুল ইসলামের গানগুলি হল—

১. জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
২. মন্দিরে মন্দিরে জাগো দেবতা!
৩. কারা পাষণ ভেদি জাগো নারায়ণ।
৪. পূজা-দেউলে, মুরারী,
৫. নাহি ভয়, নাহি ভয়।
৬. আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাঠে বরাভ (কঙ্কন ও কঙ্কা)
৭. নিরঙ্ক, মেঘে মেঘে অঙ্ক গগন। (চন্দনা)
৮. তিমির বিদারি অলক-বিহারী কৃষ্ণমুরারী আগত ওই

কারাগার নাটকের গান ও সুর যে সারা দেশে আলোড়ন তুলেছিল সেকথা জানিয়ে নাচঘর পত্রিকা লিখেছে—

“নজরুল ইসলামের গানগুলির কথাই আমরা আজ বলব। এই গানগুলি কেবল কারাগার নাটকের নয়, কেবল বাংলা সাহিত্যের নয়—বেদনা বিক্ষুব্ধ সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষে গানগুলি হয়েছে গৌরবের সামগ্রী। শুধু তাই নয় ওইসব গানের কথা, ওইসব গানের সুর যে কোন জীবন সৃষ্টির নব দৃষ্টি দিয়ে বলীয়ান মহীয়ান করে তুলতে পারে।”^{১২}

এর পরেই আমরা পাই নাটকার নজরুলকে। এর আগে নজরুল দু-একটি নাটক লিখলেও সেগুলি অভিনীত হয়নি। তা ছিল মহড়া মাত্র। এবার নজরুল লিখলেন একটি সাংকেতিক গীতিনাট্য। নাম ‘আলেয়া’ – ১৯৩১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর নাটকটি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়। মানব মানবীর প্রেমের যে বিচিত্র রহস্যময় লীলা পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলে তারই সাংকেতিক প্রকাশ ঘটেছে এ নাটকে। নাটকের ভূমিকায় কবির বক্তব্য থেকেই নাটকটির মর্ম উল্লঙ্ঘন করা যাবে—

“এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা—আলেয়ার আলো। সিন্ত হৃদয়ের জলা-ভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হ’তে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।”^{১৩}

নর-নারীর প্রেমের যে বিচিত্র রহস্য-লীলা পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলেছে তারই সাংকেতিক প্রকাশ ঘটেছে এই সাংকেতিক গীতিনাট্যে। স্বাভাবিকভাবেই এ নাটকে গানের সংখ্যাও হয়েছে বেশি এবং তার সুরও হয়েছে বিচিত্র। মঞ্চ নাটকটি দেখে কবি বুদ্ধদেব বসু ‘নাচঘর পত্রিকায় লিখেছিলেন—

“বাঙালী গীতি রসিক জাতি। গান না থাকলে বাংলা নাটক চলে না, ...নাট্যনিকেতন পুরানো প্রথা লঙ্ঘন করে নিজস্ব নূতন রীতি প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী। তাই সেখানে যখন গীতিনাট্য খোলা হল আমরা দেখতে পেলাম নজরুল ইসলামের আলেয়া। গীতিনাট্য লেখবার যোগ্যতা জীবিত বাঙালী লেখকদের মধ্যে নজরুল ইসলামের চেয়ে বেশি আর কারো নেই। প্রথমতঃ তিনি কবি, তা ছাড়া তিনি সুরশিল্পী। বাংলা সঙ্গীতে তিনি সম্পূর্ণ একটি নূতন ঢঙ প্রবর্তন করেছেন; সাহিত্যের চাইতে সঙ্গীতে তাঁর দান বেশি ছাড়া



কম নয়। হিন্দু রাগ রাগিনী ভেঙে, মিশিয়ে, নানারকম সুর তৈরি করতে তিনি ওস্তাদ। এই নজরুলের আলেয়া এমন একটি জিনিষ হয়েছে যা অত্যন্ত high brow থেকে আরম্ভ করে সাধারণ দর্শক পর্যন্ত সবাই উপভোগ করবেন। আলেয়া রূপক নাট্য; তার বিষয় বস্তু হচ্ছে নরনারীর প্রেম। গল্লাংশ খুব ক্ষীণ; বহু গানের মাঝে মাঝে অল্প ডায়লগ ছড়ানো টেকনিকের দিক থেকে একেবারে খাঁটি musical comedy. গানগুলির ভাষা আর সুর দুইই অনিন্দনীয়। নজরুলের যেটুকু করবার তিনি খুব ভালো করেই করেছেন। ডিরেক্টর সতু সেন ও প্রডিউসার প্রবোধচন্দ্র গুহর যেটুকু করবার তাও তাঁরা অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে সম্পাদনা করেছেন।”^{১৪}

‘আলেয়া’র মঞ্চভিনয়ে ঠিক কতগুলি গান ছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে নাচঘর পত্রিকা ১৩৩৮-এর ২রা পৌষ ও ৯ই পৌষ সংখ্যাদুটিতে ১০টি করে মোট ২০টি গান প্রকাশিত হয়। এগুলি হল -

২রা পৌষ সংখ্যায় : -

১. জাগো যুবতী যুবরাজ
২. আধো ধরণী আলো আধো আঁধার
৩. কে এলে গো চিরচেনা অতিথি মম
৪. ধর ধর ভর ভর
৫. যৌবন তটিনী ছুটে চলে ছলছল
৬. কে দুয়ারে এলে মোর তরুণ ভিখারি
৭. বারা ফুলদলে কে অতিথি
৮. নামিল বাদল
৯. বাগ্গার ঝাঁঝর বাজে
১০. ফুলকিশোরী জাগো জাগো

৯ই পৌষ সংখ্যায় : -

১. চাঁদনী রাতে কানন সভাতে
২. আঁধার রাতে কে গো একেলা
৩. কেন ঘুম ভাঙলে প্রিয়
৪. ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙতে
৫. নিশি নিশি মোরে ডাকে সে স্বপনে
৬. কেন বারে বারে আমি এসে
৭. যৌবনে যোগিনী আর কতকাল
৮. কেন রঙীন নেশায় মোরে রাঙালে
৯. পোহাল পোহাল নিশি খোল গো আঁখি
১০. বেসুর বীণায় ব্যাথার

তবে, ‘সমগ্র নজরুল জীবন’ গ্রন্থে বাঁধন সেনগুপ্ত লিখেছেন—

“এ নাটকে গানের সংখ্যা ছিল ২৪টি। এছাড়াও আরও দশটি গানের কথাসমূহ নাট্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল যার মধ্যে ৪টি গান মঞ্চে গাওয়া হত—

১. জাগো নারী জাগো বহির্শিখা
২. টলমল টলমল পদভরে
৩. আসিল কে অতিথি
৪. মাধবী তলে চলে মাধবিকা।”^{১৫}



অবশ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আলেয়ায় ২৮টি গান রয়েছে। যার ১২টি গানই নতুন এবং নাচঘর পত্রিকায় প্রকাশিত ৪টি গান—

১. কে এলে গো অতিথি দ্বারে মম
২. কে দুয়ারে এলে মোর তরুণ ভিখারি
৩. বারা ফুল দলে কে অতিথি
৪. কেন বারে বারে আমি এসে

সেখানে স্থান পায়নি। তবে গানগুলি যে মঞ্চে গাওয়া হত সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। কেননা, নাটকটির অভিনয় চলাকালীন প্রকাশিত পত্রিকা নাচঘর। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ‘আলেয়া’র বাকি গানগুলি হল—

১. দুলে আলো শতদল
২. মোরা ফুটিয়াছি বঁধু
৩. এসেছে নবনে বুড়ো
৪. খুঁচি খুঁচি সূচি-সারি
৫. নাচিছে নটনাথ
৬. এ নহে বিলাস বন্ধু
৭. তাহারে দেখলে হাসি
৮. জাগো নারী জাগো বহির্শিখ
৯. টলমল টলমল পদ ভরে
১০. আসিলে কে অতিথি সাঁঝে
১১. মাধবী-তলে চল মাধবিকা দল
১২. গহীন রাতে- ঘুম কে এলে ভাঙাতে

এর পরে যে নাটকের সঙ্গে নজরুলের নাম যুক্ত হয়েছে সেটি হল যতীন্দ্রমোহন সিংহের ‘ধ্রুবতারা’ উপন্যাস অবলম্বনে হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত নাটক ‘ধ্রুবতারা’। নাটকটিতে ৬টি গান যার দুটি ছিল রবীন্দ্রনাথের, বাকি চারটি গান লিখেছিলেন হেমেন্দ্র কুমার রায় যেগুলির সুর দিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। ১৯৩১ সালে ‘ঝড়ের রাতে’ নামের আরও একটি নাটকে চারটি গানের কথা ও সুর সৃষ্টি করেছেন তিনি।

মন্মথ রায়ের ‘সবিত্রী’ নাটকটি ১৬ই জৈষ্ঠ্য ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে নাট্যনিকেতনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকের সবকটি গানই নজরুল ইসলামের লেখা এবং সুরও তাঁরই দেওয়া। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নাটকের ভূমিকায় নাটকার মন্মথ রায় লিখেছেন:

“সাবিত্রীর পরম সম্পদ হইয়াছে তাহার গান। লিখিতে গর্বে এবং গৌরবে আমার বুক ভরিয়া ওঠে যে সমস্ত গানগুলির কথা এবং সুরই গীত-সুন্দর সুর-যাদুকর বাংলার কবি-দুলাল কাজী নজরুল ইসলামের সন্মোহ দান।”^{১৬}

এই নাটকের বেশিরভাগ গানই ছিল রাগ প্রধান। বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল ‘কেন করুণ সুরে হৃদয়পুরে’ গানটি। যা দেশ সুরাট রাগে তৈরি করা হয়েছিল এবং সুরলিপি গ্রন্থে এর স্বরলিপি প্রকাশ হয়েছিল। সাবিত্রী নাটকের গানগুলি হল -

১. মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে
২. প্রণমি তোমায় বন-দেবতা।
৩. জবা কুসুম সঙ্কাস ওই
৪. শুল্লা জ্যোৎস্না তিথি ফুল পুষ্প বীথি,
৫. এস এস তব যাত্রা পথে, শুভ বিজয় রথে-
৬. ফুলে ফুলে বন ফুলেল।
৭. নিসুতি রাতের শশী



৮. কুসুম সুকুমার শ্যামলতনু
৯. কেন করুণ সুরে হৃদয় পুরে বাজিছে বাঁশরী।
১০. বন বিহারিণী চপল হরিণী
১১. তোর বিদায় বেলার বন্ধুরে
১২. ঘোর ঘন ঘটা ছাইল গগন
১৩. জয় মর্তের অমৃতবাদিনী চির আয়ুত্মতী

সাবিত্রী নাটকের গান সম্পর্কে নাচঘর পত্রিকা লিখেছে -

“সাবিত্রী গান লিখেছেন নজরুল এবং প্রত্যেক গানেই তাঁর সুপরিচিত বিশেষত্বের ও উপভোগ্য সৌন্দর্যের অভাব নেই, সুতরাং সুখ্যাতি করা বাহুল্যমাত্র। এবং তাঁর দেওয়া সুরও হয়েছে মিষ্টি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রঙ্গমঞ্চের উপরে তাঁর সৃষ্ট সুরের মায়াজালের ভিতর থেকে অধিকাংশ গানেরই বাক্যাংশকে আবিষ্কার করা যায় না।”^{১৭}

এর পরে ১৯৩৬সালে নজরুল ইসলাম সুধীন্দ্রনাথ রাহার ‘সর্বহারা নাটকের জন্য গান লেখেন। নাটকটি ১৯৩৬সালের ৩০শে মে রঙমহলে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের একটি গান ব্যতীত সবগুলি গানের রচয়িতা নজরুল ইসলাম। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নাটকটির ঋণস্বীকার অংশে নাটককার লিখেছেন—

“মুখে তাদের চপল হাসি”—এই গানটা ভিন্ন, নাটকের অন্য গানগুলি সুকবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক’রছি।”^{১৮}

এই নাটকে নজরুল ইসলামের লেখা গানগুলি হল—

১. চৈতি রাতের চাঁদ যেওনা
২. নবীন বসন্ত যে যায়
৩. পাপিয়া আজ কেন ডাকে সখি
৪. সখি! দখিনা মলয়, ঝিরি ঝিরি বয়
৫. মলয় হাওয়া আসবে কবে ফুল ফোটাতে
৬. সৈ-এই রইল তোর সাধের বসন
৭. জাগো রূপের কুমার

নাটকটির পরিচালক ছিলেন সতু সেন। নাটকটি দর্শকানুকূল্য না পেলেও নজরুলের গানগুলি যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ এই নাটকের একটি গান – ‘চৈতি রাতের চাঁদ যেওনা’ গানটি মিস লক্ষ্মীর কণ্ঠে HMVতে রেকর্ডও হয়েছিল। ‘সর্বহারা’ নাটকের সঙ্গীত পরিচালক নজরুল ইসলাম সম্পর্কে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার ১৩৪১ কার্তিক সংখ্যায় মজুতবা আলি লিখেছেন— ‘মরমী হিয়ার গুঞ্জন গান তিনি, এখন আমাদিগকে মধুর ভাষায় শুনাইতে চাহেন।’ আর ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকার ১৯৪২, কার্তিক সংখ্যায় কবি আব্দুল কাদির লিখেছেন— ‘নজরুল ইসলাম হয়তো কবি ততখানি নহেন যতখানি তিনি সুরসাধক। অধুনা তিনি এক অশ্রুতপূর্ব গীতলোকে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে শুধু সুরের আলাপ।’

১৯৩৬ সালের আগস্টে সুধীন্দ্রনাথ রাহার ‘আলাদিন’ নাটকটি নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকের গানও নজরুলের। পরে নাটকটির আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

১৯৩৭ সালের ২৮-এ এপ্রিল ক্যালকাটা থিয়েটার্স নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ করে মন্থ রায়ে ‘সতী’। এই নাটকের গানগুলির রচয়িতা নজরুল ইসলাম, সুরও তাঁরই করা। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ‘সতী’ নাটকের ‘লেখকের কথা’ অংশে নাটককার লিখেছেন—

“বন্ধুবর কাজী নজরুল ইসলাম সতীর জন্য গীত রচনা ও সুর সংযোজনা করিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায় দৃশ্য পরিকল্পনা করিয়াছেন, কলালক্ষীকল্পা শ্রীযুক্তা নীহারবালা নৃত্যপরিকল্পনা করিয়াছেন, নাট্যচার্য শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র নাটকখানির প্রয়োজনা করিয়াছেন, এবং ক্যালকাটা থিয়েটার্স



স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যশোদারঞ্জন ঘোষ এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত সুধীর গুহ নাটকখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি করেন নাই।”^{১৯}

‘সতী’ নাটকের গানগুলি হল : -

১. দেব আশীর্বাদ-লহ সতী পুণ্যবর্তী
২. বিরূপ আখির কি রূপই তুই আঁকলি
৩. বাবার হ’ল বিয়ে
৪. যদি বুদ্ধির শ্রীবৃদ্ধি চাও
৫. দেবী তোমার চরণ কমল রাঙা তরুণ রাগে
৬. বাজো বাঁশরী বাজো বাঁশরী
৭. পাষাণী মেয়ে! আয়, আয় বুকে আয়
৮. ত্রিভুবনবাসী যুগল মিলন দেখে দেখ চেয়ে
৯. সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইল মাগো

১৯৩৭ সালে নজরুল ইসলাম ‘রূপকথা’ নামে একটি নাটকের দুটি গান রচনা করেন। ব্রহ্মমোহন ঠাকুর জানিয়েছেন—

“১৯৩৭ সালে এইচ এম ভি হতে মৃগালকান্তি ঘোষের গীত একটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নং এন ৯৮৬৭। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত রূপকথা নাটকের গান। রেকর্ড ক্যাটালগে জানানো হয়েছে যে রেকর্ডটির দু-দিকের দুটি গান - ১ সকাল সাঁঝে প্রভু এবং ২ তুমি আনন্দ ঘনশ্যাম - নজরুলের রচিত এবং মৃগালকান্তি ঘোষ স্বয়ং রূপকথা নাটকের গান রঙ্গমঞ্চে গাইতেন।”^{২০}

এরপর নজরুল শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের গানগুলি রচনা ও সুর সংযোজনা করেন। নাটকটি ১৯৩৮ সালের ২৯শে জুন নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নাটকের নিবেদন অংশে নাটককার লিখেছেন—

“নানা শিল্পী তাঁদের সহযোগিতা দিয়ে এই নাটককে সফল করে তুলেছেন। স্নেহাস্পদ নজরুল গান ও সুর দিয়ে, সোদরোপম সতু সেন তাঁর পরিচালনা দিয়ে, আরও বহু রকমে বহু বন্ধু অযাচিত সাহায্য দানে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধে রেখেছেন।”^{২১}

‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের গানগুলি হল : -

১. কেন প্রেম যমুনা আজি হল অধীর
২. আমি আলোর শিখা
৩. সখি, শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পীরিতি
৪. হায় পলাশী

বাঁধন সেনগুপ্ত জানিয়েছেন— “সখি, শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পীরিতি’ গানটি নাটকে পরে বর্জিত হয়। সে স্থানে কবি লিখেছিলেন নতুন একটি গান— ‘নদী একূল ভাঙে ও কূল গড়ে এই তো নদীর খেলা।’ ব্রহ্মমোহন ঠাকুরও নাট্য অ্যাকাডেমির পত্রিকার একটি প্রবন্ধে কেবল ‘নদী একূল ভাঙে’ গানটিরই উল্লেখ করেছেন।

১৯৪০ সালে মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয় আশুতোষ সান্যালের ‘বন্দিনী’ নাটকটি। এই নাটকে নজরুলের লেখা একটি গান ছিল - ‘কুসুম ফুলের মালা’। সেই সময় প্রকাশিত হরিমতী গীত নামে HMV-এর ২৭০৬১ নং রেকর্ডের একদিকে নজরুলের গানটি এবং অন্যদিকে আশুতোষ সান্যালের লেখা একটি গান ছিল এবং এই রেকর্ডেই উল্লেখ ছিল গান দুটি ‘বন্দিনী’ নাটকের।

১৯৪০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ রাহার ‘অর্জুন বিজয়’ নাটকটি মিনার্ভায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের গানগুলিও নজরুলের রচিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নাটকটির ‘একটি কথা’ অংশে লেখক ঋণ স্বীকার করে জানিয়েছেন—

“সুকবি নজরুল ইসলাম নাটকের গানগুলি রচনা করিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।”



এই নাটকের গানগুলি হল : -

১. আমি গো-রাখা রাখাল
২. এত দিনে ধরা দিলে বনের পাখি
৩. ওরা মানুষের তরে মালা গাঁথে
৪. যার তরিবার আশা নাই
৫. লহ রাজ রাজ আনিয়াছি মালা
৬. হিল্মিল্ হিমেল হাওয়ায়

এরপরে ‘যতফুল তত ভুল’ গানটি নজরুল ইসলাম লিখেছেন ‘অল্পপূর্ণা’ নাটকের জন্য। এই তথ্যটুকু কেবল জানা যায় ১৯৪১ সালে মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায় গীত টুইন কোম্পানির একটি রেকর্ড (FT১৩৬০০০) থেকে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ‘ব্ল্যাক-আউট’ রঙ্গনাট্যটি ১৯৪১ সালের আগস্টে প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভায়। এই নাটকের দুটি গান নজরুল ইসলামের লেখা - যার সুর করেছিলেন রঞ্জিত রায়। গান দুটি হল -১) ‘এবারে পূজা মাগো দশভূজা বড় দুর্গতিময়’ এবং ২) ‘ওমা পেঁচা যদি খ্যাঁচ খ্যাঁচায় মা মাচায় উঠিয়া বসি’। রঞ্জিত রায় পরে গান দুটি রেকর্ডও করেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নাটকটির ভূমিকাংশে (ভীষণ ভূমিকা) লেখক লিখেছেন—

“সুহৃদর কাজী নজরুল ইসলাম ভূতেশ্বরের দু’খানি গান রচনা করে দিয়ে এবং আমায় তা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।”^{২২}

এবার আসা যাক নজরুল ইসলামের রূপকধর্মী গীতিনাট্য ‘মধুমাল্য’ প্রসঙ্গে। নাটকটির রচনাকাল নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর থেকেই। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নাটকটির ভূমিকায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন—

“১৯৪৫ সালের কথা - রঙমহল রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কয়েকজন হ্যারিসন রোডে এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে নাট্যভারতীর উদ্বোধন করি। ...নাট্যভারতীর মালিক ছিলেন শ্রীরঘুনাথ মল্লিক ও রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর শ্বশুর স্বর্গীয় গদাধর মল্লিক। ...গদাধরবাবু ও তাঁর পুত্র শ্রীমান বিদ্যাধর মল্লিক ও জামাতা শ্রী রঘুনাথ মল্লিক একত্রে যখন একটি খুব ভালো নাটক মঞ্চস্থ করবার সংকল্প করলেন, তখন আমাদের হাতে প্রয়োজনা করার মতো কোন নাটক ছিল না। ...ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুবর কাজী নজরুল আমায় বললেন যে তাঁর একটি ভাল গীতিনাট্য লেখা আছে। সেটি যদি আমি পরিচালনার জন্য গ্রহণ করি তাহলে তিনি খুশি হবেন। ...নজরুল তার পরদিনই নাটকটি আমার হাতে দিলেন এবং সেই দিনই তা পড়ে আমি গদাধরবাবুকে শোনালাম। তিনিও গীতিনাট্যের রচনা প্রণালী দেখে মুগ্ধ হলেন। পরের দিনই বন্ধুবরকে আমি নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে এবং মধুমাল্যকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে তোলার জন্য নানারূপে পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেল। কাজী স্বয়ং তাঁর গানের রচনায় সুর সংযোগ করতে এগিয়ে এলেন - তাঁর সুর শুনে গায়কগায়িকারা মুগ্ধ হল, রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।”^{২৩}

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের এই লেখাটিতে অনেক তথ্য থাকলেও একটি বিষয়ে গুরুতর প্রমাদ ঘটে গেছে। কেননা, নাটকটি লেখার কথা তিনি ১৯৪৫ সাল উল্লেখ করেছেন। আর নজরুল সম্বিংহারা হন ১৯৪২ সালের জুলাই মাস থেকে। সুতরাং বীরেন্দ্রকৃষ্ণের উল্লিখিত সময়ে নাটকটি নিয়ে এহেন কর্মকাণ্ডে নজরুলের পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আবার হরফ থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনা সম্ভার- ২য় খণ্ডের পুস্তক পরিচিতি অংশে নাটকটির রচনাকাল ১৯৪৪ সালের অগ্রহায়ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এ তথ্যেও প্রমাদ ঘটেছে। ব্রহ্মমোহন ঠাকুর একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন নাটকটির রচনাকাল ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস - যা অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। নাটকটি রূপকধর্মী হলেও তাতে মানবিক চেতনারও সঞ্চার ঘটেছে। এই নাটকের গানগুলি হল -

১. জাগো বনলক্ষ্মী!



২. হে বিজয়ী! হে না-দেখা রূপের কুমার! (এসো এসো)
৩. সুন্দর! সুন্দর অপরূপ নন্দন-আনন্দ!
৪. মোদের মর্দানা ঢং নাচা
৫. ঘুম আয় ঘুম,
৬. এরই লাগি তপস্যা কি করে আঁধার রাতি ॥
৭. যেন দুধ সাগরের ননি দিয়ে তৈরি লো এর গা
৮. তুমি কে গো (কে কে কে)
৯. ওলো এক চাঁদকে সৃষ্টি করে বিধির পুঁজি শেষ।
১০. এ তো একা চন্দ্রমণি সে মানিকের ডালা।
১১. আয় আয় মোর ময়ূর-বিমান আকাশ নদী বেয়ে
১২. সোনার খাটে ঘুমায় কন্যা রূপোর খাটে কেশ।
১৩. নিঝুমে নিদ্রা যায় রে মধুমালা রাজার ঝিয়ারি
১৪. ভোরের তরুণ অরুণে আর পূর্ণিমার চাঁদ
১৫. কী অনল জ্বলে লো সই কী অনল জ্বলে
১৬. আমি হেরে এবার নেব লো সই বঁধুর গলার হার।
১৭. (তোমার) গান চন্দন রং উত্তরীয় মেঘডম্বুর শাড়
১৮. সাগরে কি ফিরে এলে নীল সাগরের চাঁদ?
১৯. আহা! সুনীল নীরদে ঢাকিল অরুণ
২০. পুব সাগরে ডুব দিয়ে ওই সোনার রবি উঠল রে।
২১. তুমি যেয়ো না
২২. কেউ বলতে পারো কোথায় আমার মধুমালার দেশ?
২৩. এই কাঞ্চননগরের বাদশা নাম দণ্ডধর,
২৪. আমারে ভাসালে অসীম আকাশে তোমারে ভাসানু জলে
২৫. (ওরে ও) পদ্মা নদী বলতে পারিস কোথায় মধুমালা?
২৬. বোন রে বোন এ কোন্ রূপ দেখালি,
২৭. আমরা বনের পাখি বনের দেশে থাকি।
২৮. মধুর মধুর! আজি সকলই মধুর
২৯. ও বন-পথ! ওরে নদী কোথায় রে তোর শেষ?
৩০. ফুলের হাওয়া যারে ছুটে মধুমালার দেশ।
৩১. তুমি হেসে চলে গেলে বন্ধু তোমার কাঁটার পথে।
৩২. তুমি এতদিনে মরণ টানে টানলে বুকের কাছে
৩৩. সাগরজলে খেলতে এল তোর আকাশের চাঁদ।
৩৪. বন্ধু বিদায়!
৩৫. আমার পায়ের বেড়ি এই সোনার পুরী
৩৬. নিশির পাহারা ভেঙে চোর এসেছে ঘর
৩৭. অনেক জ্বালা দিয়েছ তার শান্তি পাবে কালা।
৩৮. ওগো বন্ধু। দাও সাড়া দাও এই কি পথেব শেষ?

নজরুল ইসলাম রচিত আরও একাধিক রূপক ও সাংকেতিক নাটক রয়েছে। এগুলি হল -



ঝিলিমিলি: নভেম্বর, ১৯৩০ সালে রচিত ছোট এই রোমান্টিক প্রেম কাহিনীতে ধরা রয়েছে প্রেম ও বিরহের চিরন্তন আবেদন। এর গানগুলি হল -

১. ঝরে ঝরঝর কোন গভীর গোপন-ধারা এ শাওন;
২. হৃদয় যত নিষেধ হানে
৩. শুকাল মিলন মালা আমি তবে যাই;
৪. স্মরণ পারের ওগো প্রিয়।

সেতুবন্ধ: এই সাংকেতিক একাক্ষিকটির দুটি দৃশ্য প্রথমে মাসিক নওরোজ পত্রিকার ১৩৪৪ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'সারা ব্রীজ' শিরোনামে। তৃতীয় দৃশ্যটি পরবর্তীতে কবি সংযোজন করেন। প্রকৃতি ও মানুষের চিরন্তন দ্বন্দ্বের কাহিনী নিয়ে এ নাটক বিধৃত। এই নাটকের গান গুলি হল -

১. গরজে গম্বীর গগনে কন্ঠ;
২. অধীর অম্বরে গুরু গরজন মৃদু বাজে;
৩. হাজার তারার হার হয়ে গো দুর্লি আকাশ বীণার গলে;
৪. নমো হে নমো যন্ত্রপাতি;
৫. চরণ ফেলি গো মরণ ছন্দে;
৬. নমো নমো নম হিম গিরি সুতা;
৭. হর হর শঙ্কর! জয় শিব শঙ্কর।

ভূতের ভর: এই নাটকটিতে রূপকের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনীকে তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকের গানগুলি হল -

১. জাগো জাগো দেবলোক;
২. মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব;
৩. আছে তোদের গায়ে ভূতের লেখা;
৪. বজ্র আলোক মৃত্যুর সাথে হবে নব পরিচয়।

নজরুল ইসলামের আরও একটি একাক্ষ রূপক নাটক হল 'শিল্পী'। তবে এ নাটকে কোনো গান নেই।

এই নিবন্ধে কেবল মঞ্চনাটকের কথাই আলোচিত হল। এছাড়াও নজরুল কিছু রেকর্ড নাটক এবং আকাশবাণীতে প্রচারের জন্য কিছু শ্রুতি নাটক লিখেছিলেন যাতে তাঁর লেখা ও সুর করা গান যেমন আছে তেমনি একই সাথে অন্যের লেখা শ্রুতি নাটকের জন্যও গান রচনা ও সুরারোপ করেছিলেন।

Reference:

১. চক্রবর্তী, নরেন্দ্র নারায়ণ, 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে',
২. বাঁধন সেনগুপ্ত, 'সমগ্র নজরুল জীবন প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৩১
৩. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'রক্তকমল', আর্ষ্য সাহিত্য ভবন, ১৩৩৬
৪. তদেব।
৫. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'বাংলার নাটক ও নাট্যশালা', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৬৪
৬. মন্থ রায়, 'মহুয়া', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৯৩০
৭. সরযুবালা দেবী, কাজীদার স্মৃতিকথা, নজরুল স্মৃতি, সাহিত্যম।
৮. নাচঘর ১৯শে পৌষ, ১৩৩৬
৯. নাচঘর ২৬শে পৌষ, ১৩৩৬



১০. মন্থ রায়, 'কারাগার', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৯৩০
১১. নাচঘর, ওরা পৌষ, ১৩৩৭
১২. নাচঘর, ১০ই পৌষ, ১৩৩৭
১৩. নজরুল ইসলাম, 'আলেয়া', ডি এম লাইব্রেরি, ১৩৩৮
১৪. নাচঘর, ৯ই পৌষ, ১৩৩৮
১৫. বাঁধন সেনগুপ্ত, 'সমগ্র নজরুল জীবন প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি, কলিকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৭৯।
১৬. মন্থ রায়, 'নাট্য গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, সাবিত্রী, মনমথন প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ১২৪
১৭. নাচঘর, ৫ই আষাঢ়, ১৩৩৮
১৮. সুধীন্দ্রনাথ রাহা, 'সর্বহারা', ভট্টাচার্য সন্স লিমিটেড, কলিকাতা ১৯৩৬
১৯. মন্থ রায়, 'সতী' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩৪৪
২০. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান, নাট্যঅ্যাকাডেমি পত্রিকা, সংখ্যা ৩, পৃ. ১২৩
২১. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'সিরাজদ্দৌলা', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা ১৩৪৫
২২. বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, 'ব্ল্যাক-আউট', স্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১৩৪৮
২৩. বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, 'মধুমালার গোড়ার কথা' - নজরুল ইসলাম, 'মধুমালার', জে সি রায়, কলিকাতা ১৩৬৫